সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা দর্শন ভাবনায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দের ভূমিকা

ড. দয়াময় মন্ডল

‘ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোর্তিময়, তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।’

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অজ্ঞতা, জড়তা, অন্ধকুসংস্কার দূরীভূত করে বন্ধন মুক্ত জ্ঞানের আলোয় জীবনের গতি স্পন্দন অনুভব করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্যের নব শিক্ষাধারার চেতনা থেকেই হৃদয়ে অনুভব করতে চেয়েছিলেন গতি স্পন্দন। কিন্তু ভারতে ইতিহাসে মধ্যযুগের শেষ পর্বে মুঘল আমল থেকে শুরু হয়েছিল শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবক্ষয়ের সূচনা। রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষয়িষ্ণুতার পথে আর সামাজিক জীবনে নেমে আসে অশান্তির আগুন। মানুষ নীতিজ্ঞানহীন দিশেহারা হয়ে পড়লো। অন্ধকুসংস্কার সংকীর্ন ধর্মীয় প্রথাবদ্ধ শিক্ষার আর্বতে মানুষের জীবন যন্ত্রনাদীর্ন ও দুর্বিসহ হয়ে উঠল। রাতে ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় টপ্পা, খেউড়, কবিগানের চটুলতায় সকলের মন মজে থাকে। ধর্মীয় রক্ষনশীলতার বেড়াজালে নর-নারীরা পিষ্ট হয়ে দিশাহীন ভাবে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। চেতনাহীন, অনুভূতিহীন, বিবেকহীন স্থবির জীবন যেন মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রাদায়ক হয়ে উঠেছে। কবি অজিত দত্তের ভাষায় -

‘জীবন জীবনহীন, রুদ্ধপ্রাণ, অবরুদ্ধ আশা,
বনহীন দ্যুতিহীন দিন গুলি বিরস মলিন,
এই মৃত্যু, হে ঈশ্বর, আর কত? আর কত দিন?’

অবক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু, দিশাহীন ধর্মীয় বেড়া জালে আবদ্ধ ভারতবর্ষের মাটিতে হতভাগ্য সিরাজের পরাজয় এবং রবার্ট ক্লাইভের উত্থানে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুত্থান। ‘একদা বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ড রূপে’। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার ভাবধারায় সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবজোয়ার বইতে লাগল। অন্ধকুসংস্কার ভেদ করে জীবন চেতনায় এল ভাবাবেগের আলোড়ন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, সমাজ ভাবাদর্শে শিক্ষা-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যাকে ব্যাপক অর্থে আমরা ভারতের ইতিহাসে নবজাগরণ বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। ভারতের হতিহাসে নবজাগরণের সূচনা প্রথম বাংলায়, পরে সর্বত্রয় ছড়িয়ে পড়ে। কেননা ব্রিটিশ এবং মিশনারীদের কর্মস্থল ছিল বাংলার মাটি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নবজাগরণের জোয়ার বইতে থাকে। একদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনার আলোকে শিক্ষার প্রসার আপর দিকে দেশীয় পন্ডিতেরা প্রাচ্যের আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ভাবে সংস্কারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। প্রথম দলে যোগ দিয়ে ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ আর দ্বিতীয় দলে যোগ দিয়েছিলেন রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কায় প্রমুখ পন্ডিত ব্যক্তিরা।

মধ্যযুগের মহামানব হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ছিলেন যুগনায়ক। ভারতবষের্র ইতিহাসে যিনি জাতির জীবনে প্রথম সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। অবক্ষয়, ঘুনধরা সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে জাত-পাত আর ভেদ-বৈষম্যের রাজনীতি পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতিকে নতুন মানব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বলেছিলেন-চন্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ন। সমাজ-জীবন থেকে অস্পৃশ্যতা মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নর-নারীদের নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। কোরান-পুরাণের কোনো বৈষম্য মানতেন না। মানুষে মানুষে নেই কোনো ভেদাভেদ। সমাজ সংস্কারের এ এক বৃহৎ দর্শন-বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের তিরোধানের পর ভারতবর্ষের নর-নারীদের জীবন ধারায় অস্পৃশ্যতা আর জাত পাতের ভেদ-বৈষম্যে জীবনের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। অন্ধ-সংস্কার বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা ও ব্যাভিচার জীবন যাত্রা মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে তোলে। কিন্তু কালের স্রোতে চলমান সমাজ জীবনের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বণিকের ছদ্মবেশে এদেশে এলেন ইংরেজরা। ধীরে ধীরে শাসনভার কায়েম করলেন। দেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিচর্চার নতুন হাওয়া বইতে লাগল। ভারতবাসীর অসাড়, পঙ্গু ও শ্লথ জীবনে এল গতি স্পন্দন। ভারতবষের্র মানুষ পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রনার মধ্যেও নিজেদের অসাড়, পঙ্গু ও শ্লথ জীবনের দৈন্য দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এলেন। জরাজীর্ন ও কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজজীবন সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। এগিয়ে এলেন চৈতন্যদেবের উত্তরসূরী হিসেবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর বিবেকানন্দের মতো দেশ নায়কেরা। যারা ভারতবর্ষের মাটিতে নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসেবে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে জ্ঞানের আলোয় গ্রহন করলেন। যার ফলে সমাজজীবন ধারার বিভিন্ন খাতে এল পরিবর্তনের জোয়ার। যেমন -

১। অজ্ঞ, অসাড় ও অন্ধ-কুসংস্কার সমাজে জাতির জীবনকে শ্লথ ও বিপন্ন করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও যুক্তি দর্শনের আলোয় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ অজ্ঞ, অসাড় দিশে হারা জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধের ভাবধারা জাগ্রত করেছিলেন। জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধ চেতনা থেকে জন্ম নেয় সমাজ পরিবর্তনের ধারা।

২। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সহমরন, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, জোর পূর্বক মেয়েদের সেবাদাসী গ্রহন এর মতো অজস্র কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমাজে কুপ্রথা নিবারণে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। ব্রিটিশ রাজশক্তির আইনি সহায়তায় এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সমাজ বিপ্লবের আদর্শকে পাথেয় করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজের বুক থেকে কুপ্রথা উচ্ছেদ করার মূল মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো স্মরণীয় সমাজ সংস্কার মূলক মহতি কাজের চিন্তা ভাবনা ধর্মান্ধ দিশাহীন মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের মানুষের চিন্তা চেতনায় আর এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

৩। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দ প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার আলোকে সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করেছিলেন। বিবেকানন্দ সনাতন ভারতবর্ষে চন্ডাল-মুচি-মেথর এদের আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

৪। সমাজশিক্ষাকে হাতিয়ার করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও দেশপ্রেম মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

৫। সমাজশিক্ষা সংস্কারের মধ্য দিয়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ সমাজজীবনে সাম্য মতাদর্শ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

নগজাগরণের তরঙ্গায়িত ঢেউ-এ বাঙ্‌লার সমাজ সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে বাঙ্‌লার সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা সমাজে জাতি গঠনের সহায়ক হয়ে উঠে। বাঙ্‌লার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর এদের মতো বুদ্ধিজীবীদের মতাদর্শে জাতি গঠনের শিক্ষাকে গ্রহন করেন। সুতরাং পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বাঙ্‌লার শিক্ষা ব্যবস্থায় নবজাগরণের ভূমিকাকে কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা ব্যবস্থার গতিস্রোত নদীর মতো বাঁক নিয়ে নিয়ে বইতে থাকে বেগবতীর স্রোতোস্বিনী ধারায়।

১। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সাম্য-মৈত্রীর-আদর্শে বাঙ্‌লার সমাজ ব্যবস্থায় আশ্রমকেন্দ্রীক আর্ধ্যাত্মিক শিক্ষা আর টোল-মন্ডপের অচলায়তনে পুঁথি শিক্ষার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বাঙ্‌লার নর-নারীরা তন্ত্র মন্ত্র, পুঁথি শিক্ষা এবং প্রথাগত শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে।

২। নবজাগরণের আলোয় বাঙলার সমাজ ব্যবস্থায় নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। পাশ্চাত্যের নারী শিক্ষার অগ্রগতির ধারা ভারতীয় সমাজ সভ্যতায় সঙ্কীর্ন গন্ডী অতিক্রম করে মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৪। সমাজে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রতি ছেলে-মেয়েদের আগ্রহবোধ জন্মে।

৫। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাঙলায় মাতৃ ভাষায় শিক্ষা চর্চা জোর কদমে শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এরা সবাই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া শুনার জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন।

৬। স্কুল-কলেজে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে গনিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, অস্থিবিদ্যা, নীতি শিক্ষা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার প্রয়াস ঘটে।

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির নবজোয়ারে ঊনবিংশ শতকে শিক্ষা আন্দোলন এক বড় ভূমিকা নিয়েছিল। শিক্ষা আন্দোলনের ধারায় যারা বাঙালির হৃদয়ে আজও অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে অগ্রগন্য হলেন ভারত পথিক রামমোহন, মানবদরদী শিক্ষানায়ক বিদ্যাসাগর এবং বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ধারায় প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি আধুনিক বাংলার রূপকার। ইংরেজি, বাংলা, ল্যাটিন, ফাসী, হিব্রু, মারাঠী ও গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় তার অসাধারন পান্ডিত্য ছিল। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি-কুসংস্কার আর পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সতীদাহের মতো কুপ্রথা সমাজ থেকে উচ্ছেদের জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে আইন প্রনয়নে সাহায্য করেছিলেন। সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ রদ করার জন্য কঠোর সংগ্রাম

করেছিলেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিদর্শনের শিক্ষায় সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষা প্রসারে তার অবদানও কম নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। শিক্ষার উন্নয়ন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে ইংরেজি শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য বাংলায় অ্যাংলো হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার যুব সমাজের কাছে ন্যায়, তত্ত্ব দর্শন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষায় গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্রিটিশদের শিক্ষানীতির প্রতি আকৃষ্ট হন।

রামমোহন প্রাচ্য শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মকে পরিশীলিত করার জন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোরান আর পুরাণের সার সংক্ষেপ করে যুব সমাজের সামনে নীতিশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা প্রচার করেছিলেন। যুবসমাজকে মূল্যবোধের শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক ছাড়াও আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা ছিলেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য মাতৃ ভাষায় শিক্ষা চর্চা শুরু করেন। বেদ, উপনিষদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ বাংলার অনুবাদ করে লোকসাধারনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি তর্ক-বিতর্ক মূলক গদ্য নিবন্ধ - 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৭) 'সহমরন বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ' (১৮১৮) প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। যুক্তি ও মনোবিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শন ও সমাজদর্শন বাঙালিদের কাছে হৃদয়ধর্মে মেলে ধরেছেন। রামমোহন রায় হলেন প্রথম বাঙালি যিনি গদ্য ভাষাকে মাধুর্য মন্ডিত করে তোলেন-বাক্য বিন্যাস ও ছেদ-যতি চিহ্নের সুষ্ঠ রূপায়নে। সুতরাং শিক্ষা রূপায়নে, শিক্ষা প্রসারের পটভূমিকার নবজাগরণে তার আর্বিভাব এবং কর্ম প্রেরণা সমগ্র বাঙালিদের কাছে আজ গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বঙ্গ জননীর সুসন্তান বিদ্যাসাগর। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক আর নারী শিক্ষার অগ্রদূত। সংস্কৃত ভাষায় তার গভীর বুৎপত্তি ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ছিল তার গভীর আনুগত্য। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ইংরেজি ভাষায় পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা চর্চা করে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। আসলে বিদ্যাসগর নিজের শিক্ষা দর্শনকে বাংলার ছাত্রদের হৃদয়ে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার মতে ছাত্রদের জ্ঞানের আলোর বিকাশের ধারায় হল উপযুক্ত শিক্ষা। বিদ্যাসাগর বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় শিক্ষা চর্চার বিকাশের মধ্য দিয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সংস্কার মুক্ত মন গড়ে তোলার উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার রসদ সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র চর্চা না করলে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। এইজন্য সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত, বাংলা ভাষা চর্চার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের হিন্দু দর্শন শাস্ত্র পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ দেশের সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের শিক্ষা অর্জন সম্ভবপর নয়। উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহন করে ছাত্রদেরই সমাজ সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সংস্কৃত কলেজে ছাত্র পাঠক্রম শিক্ষায় বিজ্ঞান ভিত্তিক পঠন পাঠনের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সারা বাংলার শিক্ষানীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর চিন্তাশক্তি ও কর্ম প্রেরণার মন্ত্রেই বাংলার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা আর নারী শিক্ষা প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বাংলার নব্বই শতাংশ শিশু দারিদ্র, অভাব, অনটনের দরুন শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। আবার সমাজ কাঠামোয় যারা প্রথাগত পুঁথি শিক্ষা ও ধর্মীয় ভাবাবেগের শিক্ষা গ্রহন করে চলেছে তাতেও তাদের মনুষ্যত্ব অর্জন হয় না। বরং ছাঁচে ঢালা শিক্ষায় মনুষ্যত্ব টেঁকে না। শিক্ষায় মনুষ্যত্ব অর্জনের অভাব। এইজন্যই তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। বাংলার ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য স্কুল-কলেজ নেই। মেয়েরা শিক্ষা গ্রহনে উৎসাহী নয়। ছাত্রদের সমাজদর্শন শিক্ষার উপযুক্ত মাতৃভাষার পাঠ্য পুস্তক নেই। ছাত্রদের অসুবিধা আর দুঃখের কথা ভেবে শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও নীতিবোধের আর্দশে প্রথম পাঠক্রম ভিত্তিক শিক্ষানীতির সফল রূপায়ন করেন সংস্কৃত কলেজে। এইজন্য অনেকে আধুনিক 'শিক্ষাচিন্তার জনক' বলে বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেন।

বিদ্যাসাগরের মহৎ কাজ হল সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি বাঙালির হৃদয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। আজীবন তিনি শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্রতী ছিলেন। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বাংলা স্কুল স্থাপন করেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারেও তাঁর অবদান অসামান্য। বেথুন সাহেব ১৮৪৯ সালে কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের মুখ্য পরামর্শদাতা ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এমনকি বেথুন সাহেবের অনুরোধে তিনি স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পাঠক্রম ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। পাঠ্য পুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিকাশ সাধন করেছিলেন। 'বর্ণ পরিচয়' পাঠ করে আজও আমদের শিক্ষার হাতেখড়ি এবং প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হয়। 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'কথামালা' (১৮৫৬) প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক গুলি নীতিশিক্ষা ও মুল্যবোধ শিক্ষার আকর গ্রন্থ। শিশু হৃদয়ে শিক্ষার্জনের রসগ্রাহী গ্রন্থ রূপে বিবেচিত।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় তথা বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রচার ও হিন্দু ধর্ম সংস্কারে বিবেকানন্দের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যখন বাঙালি সমাজে কুসংস্কার, জড়তা আর অজ্ঞানতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তোলার মহান ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন, ঠিক সেই সান্ধিলগ্নে ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ বিবেকানন্দ আর্বিভূত হন (১৮৬২), বিবেকানন্দ ছিলেন যুক্তিবাদী। পাশ্চাত্য দর্শন আর যুক্তিতর্কের নিরিখে ভারতীয় সমাজ জীবনে আধ্যাত্ম ভাবনার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। বাস্তব জগতের ধ্যান ধারনা আর মূল্যবোধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের আদর্শকে বিশ্বের দরবারে মেলে ধরেছিলেন। তিনি ছিলেন জাতির জীবনে শিক্ষার নায়ক। আধ্যাত্ম চিন্তা, আলাপ আলোচনা আর পুস্তক পুস্তিকা রচনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব শিক্ষা দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রবর্তিত শিক্ষা দর্শনে ভারতীয় সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে জাতীয় চেতনায় উন্মেষ ঘটে। ধর্মীয় সংকটে বাঙালিরা দিশেহারা, বিদেশী শাসন শোষনে নিরক্ত প্রাণহীন এই রকমই এক চরম মুহূর্তে বিবেকানন্দ ত্যাগ, আদর্শ ও জীবন বোধের শিক্ষাদর্শে সকল ভারতবাসীকে অনুপ্রানিত করেছিলেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তাবোধ ভাবধারার উদ্দীপিত আদর্শে দেশপ্রেম, জাতিপ্রেমের মূল্যবোধ গড়ে তোলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে একত্র করে সগর্বে বলেছিলেন - "ভুলিও না-নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত্ত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" বিবেকানন্দের এই মহান চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদর্শনের বীজ লুকিয়ে আছে।

বিবেকানন্দ সব সময় বিশ্বাস করতেন মনুষ্যত্বের শিক্ষায়। যা গ্রহন করলে জ্ঞান-বিবেক ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়। তাঁর মতে শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের পরিপূর্ন বিকাশ। অর্থাৎ "Education is the Manifestation of the perfection already in man" চকমকি পাথরের অভ্যন্তরে যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে থাকে তেমনি প্রতিটি মানুষের অন্তর হৃদয়ে লুকিয়ে আছে সুপ্ত জ্ঞান আর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ। ঘর্ষন করলেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। প্রজ্বলিত আলোক শিখাই হল জ্ঞান বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ। বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ ঘটলে হৃদয়ে মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। আর হৃদয়ে মূল্যবোধ জাগ্রত হলে মনে কর্তব্য, ন্যায়-নিষ্ঠা জন্মে। আর তখনই প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ে জন্ম নেয় আদর্শ শিক্ষা। বিবেকানন্দ এই মহান আদর্শ শিক্ষা ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু ধর্মের নব ব্যাক্ষ্যা দিয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনের মধ্য দিয়ে যুব শক্তিকে নব আধ্যাত্ম চেতনার ভাবধারায় মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন -

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।।"

'জীব জ্ঞানে শিব সেবা' - এ এক মহানুভবতার শিক্ষাদর্শন। বিবেকানন্দ সমাজ জীবনে মানবতাবোধের শিক্ষাদর্শনে যুবসমাজকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে দেশের যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষা, নারী জাতিকে আত্ম শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ার আহ্বান জানান। নারীত্বের বিকাশ সতীত্বে, মাতৃত্বে আর মমত্ববোধের আদর্শে। সমাজে নারীদের শিক্ষা এবং হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন।

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে বাংলাদেশে বাঙালির হৃদয়ে নবজাগরণের জোয়ারের তরঙ্গায়িত ঢেউ-এর আঘাতে অন্ধসংস্কার, স্থূলতা, অজ্ঞানতা, ধর্মীয় বৈষম্য এবং সামাজিক ব্যাভিচার, সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে প্লাবিত ধারায় হৃদয় ধর্মে নবমানবতাবোধের চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। জাতীয় চেতনায় নব শিক্ষার ভাবাবেগে যারা আপ্লুত হয়ে শিক্ষা দর্শনের জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথমার্ধের অগ্রগন্য মনীষীরা হলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম চন্দ্র ও বিবেকানন্দ। এদের শিক্ষা দর্শনের আদর্শে আজও বাঙালিরা উজ্জীবিত প্রাণ ধারার স্পন্দনে স্পন্দিত।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। ছাত্র জীবনের কর্তব্য - স্বামী বিরজানন্দ
২। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ - স্বামী প্রভানন্দ
৩। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস - গৌরদাস হালদার
(আধুনিক যুগ)
৪। সাহিত্যিকা - ড. সুবোধ চৌধুরী
৫। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - ১০ম খন্ড, ৫ম খন্ড সংস্করণ, ১৯৮৩